মুসলিম মস্তিষ্ক

বিজ্ঞানের অনবদ্য গল্প

আরমান ফিরমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

লাইব্রেরি ১৩
কেমিস্ট্রির বাপ ২১
বিদায় ঘণ্টা ২৯
অনুবাদের সুনামি ৩৬
সফল উড়ন্ত পাখিমানব ৪৭
বানু মুসা—থ্রিলিং থ্রি ৫২
বন্দি বিজ্ঞানী ৬১
জাগ্রতের জীবিত সন্তান ৬৫
The Physicist: ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানী ৭৫
মেকানিক্যাল মাইন্ড : মধ্যযুগে রোবটিক্স ৮৩
সার্জারির স্যার ৯০
দার্শনিক ব্যক্তিত্ব ৯৬
গাণিতিক মুসলিম ১০৯
মুসলিম বিজ্ঞানীদের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল ১১৭
বিজ্ঞানে আলিমগণ ১২৯
বিবর্তনবাদ ও মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ১৪২
নারী ১৫২
সেটা জিবারিশ... .... ১৬২
বিজ্ঞানের ইতিহাস ১৭০
ইবনুন নাফিসের কৃতিত্ব ১৭৮
সূর্যোদয় ১৮৭
Glossary ১৯৯
Select Bibliography ২০৪

> Science owes a great deal more to the Arab culture Ɀslam], It owes to its existence. —Robert Briffault
>
> *The Making of Humanity* 'George Allen and Unwin, 1928), p: 191.

লাইব্রেরি

স্কুল থেকে আমাদের একটা লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া হলো। বিশাল এক লাইব্রেরি। ম্যাডাম আমাদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দিলেন এবং বললেন— 'প্রত্যেকে এসে আমাকে বলবে, তোমাদের পাওয়া যুগে বিজ্ঞান পৃথিবীতে কেমন প্রভাব ফেলেছিল।'

আমি, সিনান ও তারিক এক গ্রুপে। ম্যাডাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তোমাদের জন্য কাজটা খানিকটা চ্যালেঞ্জের। কারণ, তোমরা পাচ্ছ মধ্যযুগ। অবশ্য কেউ কেউ একে অন্ধকার যুগও বলে থাকে।'

'বোরিং!' তারিকের দীর্ঘশ্বাস। আমি এমনিতেই বইপাগল। ভেবেছিলাম—এত বিশাল এক লাইব্রেরিতে এসে মজা হবে, আর ম্যাডাম কিনা ধরিয়ে দিলেন মধ্যযুগ!

দ্বিতীয় তলায় উঠলাম। লাইব্রেরিয়ানকে দেখতে পেলাম। অর্থাৎ, মনে হয় তিনিই লাইব্রেরিয়ান।

'অন্ধকার যুগে কী আর থাকবে!' অবশেষে সিনান মুখ খুলল। সে-ই লাইব্রেরিয়ান মশাইকে জিজ্ঞেস করল—'অন্ধকার যুগের বিজ্ঞানযাত্রার ব্যাপারে কোনো বইপত্র আছে?'

লাইব্রেরিয়ান দেখি আমাদের পাত্তাও দেন না। কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পর বললেন—'বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলতে কিছু নেই।' লাইব্রেরিয়ানের পাশেই একটি অসাধারণ যন্ত্রের ওপর চোখ গেল। একটু হাত বাড়াতেই লাইব্রেরিয়ান বাধা দিলেন—'আরে ধরো না, এটা অমূল্য।'

লাইব্রেরিয়ান আপন মনে তার কাজ সেরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তোমাদের মাথায় তো কিছু শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে। ১০০০টা বছর বিলকুল নষ্ট। এটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক কৃষ্ণ গহ্বর, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, কিছুটা।' সিনানের উত্তর।

‘তোমরা ধরেই নিয়েছ, এই সময়টায় শুধু খুন-খারাবি হয়েছে। কিছুই আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু না, এমনটা ভাবলে চলবে না। যাও, নিজেদের কাজ করো গিয়ে।’ লাইব্রেরিয়ানের শক্ত প্রতিক্রিয়া।

তারিক বলল—‘আরে চল ফিরে যাই। সবাই জানে, গ্রিক আর রোমানরাই সবকিছু আবিষ্কার করেছে।’

‘কী বললে?’ পেছন থেকে লাইব্রেরিয়ানের ঝাঁজাল কণ্ঠ।

আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে যাচ্ছে ভেবে তারিককে বলতে না দিয়ে আমি বললাম—‘না মানে, এই আজকের জন্য ফিরে যাব ভাবছি।’

‘শুধুই গ্রিক আর রোমান, তাই না?’ লাইব্রেরিয়ান কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কী যেন। তারপর বললেন—‘তোমাদের জন্য উপযুক্ত একটা বই আছে। এসো আমার সাথে।’

এ বলে তিনি হাঁটা দিলেন। আমরাও নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে চললাম তার পিছু পিছু। কিছুক্ষণ পর বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম—‘যাচ্ছিটা কোথায়?’

তারিক বলল—‘লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেই পারিস।’

পেছন থেকে সরল কণ্ঠে সিনান জিজ্ঞেস করল—‘আমরা কই যাচ্ছি?’

লাইব্রেরিয়ান বললেন—‘অন্ধকার থেকে আলোতে। এমন কিছু জিনিস আছে, যা তোমাদের জানা উচিত।’

একটি রুমে ঢুকলাম। আমাদের বসতে বলে তিনি একটি বই এনে আমাদের সামনে রাখলেন। বইটি বেশ মোটাসোটা। তারিক খোলার দায়িত্ব নিল। খোলার আগে নামটা দেখতে পারলাম না। ভেতরে দাড়িওয়ালা অনেক মানুষের ছবি। সিনান লাইব্রেরিয়ানের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। লাইব্রেরিয়ান বললেন— ‘অন্ধকার যুগে স্বাগত অথবা যে নামে এই সময়টাকে চেনা উচিত—স্বর্ণযুগ!’

কেমিস্ট্রির বাপ

তারিকের পাশে আমরা দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে। সে-ও আমাদের দিকে না তাকিয়ে পড়েই যাচ্ছে। ওর হাতের বইটির নাম দেখতে পাচ্ছি এখন *1001 Inventions*। নিচের সাব টাইটেলটা পড়তে পারছি না। তারিককে ডাক দিতে চাইছিলাম, কিন্তু সিনান নিষেধ করল। তার মতে, গভীর মনোযোগ সহকারে কেউ কিছু পড়তে থাকলে তাকে ডিস্টার্ব করা উচিত না।

হঠাৎ তারিক মুরগিওয়ালার মতো চিল্লিয়ে উঠল—‘কেমিস্ট্রির বাপ!’

আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—‘মানে?’

তারিক বলল—‘রবার্ট বয়েল, জন ডাল্টনের নাম তো শুনেছিস। কিন্তু কেমিস্ট্রির জনক জাবির ইবনে হাইয়ানকে চিনিস? একাধারে কেমিস্ট, অ্যালকেমিস্ট, অ্যাস্ট্রনমার, অ্যাস্ট্রলজার, ইঞ্জিনিয়ার, জিওগ্রাফার, ফিলোসফার, ফার্মাসিস্ট, ফিজিসিস্ট আর ফিজিশিয়ান। একেবারে একের ভেতরে ১০!’

সিনান অবাক না হয়ে উত্তর দিলো—‘থাক। তোকে বলতে হবে না। জাবির ইবনে হাইয়ান ভালোই বিখ্যাত। বিভিন্ন জায়গায় তার নাম দেখা যায়। *Paulo Coelho* তার ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার। *The Alchemist*-এ জাবির ইবনে হাইয়ানের ল্যাটিনাইজড রূপ গেবার ব্যবহার করা হয়েছে।’ আমার দিকে তাকিয়ে বলল—‘তুইও তো মনে হয় চিনিস, না?’

‘হ্যা চিনি। “১০০ বিজ্ঞানীর জীবনী” টাইপের বইগুলোতে তার নাম থাকে।’

এ সময় লাইব্রেরিয়ান আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—‘তোমাদের এখানে আসার আগে ধারণা ছিল গ্রিক ও রোমানরা সব করেছে, এরপর বিজ্ঞান উন্নত হয়েছে ইউরোপে; রোমান আর ইউরোপের মাঝে কিছু নেই। এখন আশা করি তোমাদের মস্তিষ্ক কিছুটা আলোকিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারেই আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলাম।

মূলত ইতিহাসবিদরা সব সময় চেয়েছে নন-ইউরোপিয়ান বিজ্ঞানীদের দারুণ দারুণ সব ইতিহাসগুলো গোপন রাখতে। জর্জ সারটনকে চেনো? বিজ্ঞানের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদদের একজন। অনেকে তাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের জনকও বলে। সাবজেক্ট হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয় তার সময়েই—প্রায় ১০০ বছর আগে। তিনি বলেছেন—“ইতিহাসবিদরা মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ব্যাপারে আমাদের একদম মিথ্যা ধারণা দিয়েছেন।” এর মূল কারণ কি, জানো? খুব দুর্বল সূত্রের ওপর জোর দেওয়া আর পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার অন্ধ অনুকরণ। শিল্প ছাড়া মধ্যযুগের বাকি সব দিককে ইতিহাসবিশারদরা অন্ধকার হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু মূল অন্ধকার তো ওই যুগের আলোর ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা!’[১]

ইউরোসেন্ট্রিক ইতিহাসবিদরা কারও প্রতি ঋণই স্বীকার করতে চায় না। তা তো চায়ই না, এমনকী অন্যান্য জাতিগুলো যে নিজেদের মধ্যে সেরা সেরা কাজ করেছে, সেটা পর্যন্ত লুকায়। তারা দেখাতে চায়, শুধু ইউরোপিয়ানরাই সব করেছে; বাকি সব জিরো। উদাহরণস্বরূপ, জিম্বাবুয়ের চমৎকার আর্কিটেকচারকে নন-আফ্রিকান আর্কিটেকচার প্রমাণ করার জন্য বর্ণবাদী উপনিবেশরা অনেক চেষ্টা করে।’[২]

সফল উড়ন্ত পাখিমানব

প্রথম পিরিয়ড শেষ। টিচারের কোনো খবর নেই। আজ নাকি কোনো এক বছরের এসএসসি ব্যাচের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। প্রথম পিরিয়ডে শুধু হাজিরা নিয়ে ম্যাডাম চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন চুপচাপ থাকতে, যেন টু শব্দটিও না করি। এবারের পুনর্মিলনে নাকি অনেক খরচা করা হয়েছে। শোনা যায়, এই ব্যাচের ভাই-বোনরা ছিল আমাদের স্কুলের ইতিহাসে সবচেয়ে সার্থক ব্যাচ। একাধিক পপুলার সিঙ্গার, ডান্সার আনা হয়েছে। তার মধ্যে মিনার নামক একজন নাকি আমাদের স্কুল সংলগ্ন কলেজের শিক্ষার্থী। আর এসব জেনেছি রনি থেকে, ভালোই অপ্রয়োজনীয় তথ্য রাখে ছেলেটি।

ভালোই হয়েছে! আজ আব্বাস ইবনে ফিরনাসকে নিয়ে কথা হবে।

ক্লাসের পেছনের দিকের কোনায় বিপথগামী পোলাপানদের আড্ডা। আমাদের মুসলিম গ্যাং সামনের দিকের কোনায়। আজ জমবে, ইনশাআল্লাহ।

সিনান শুরু করল—‘মুয়াজ্জিন যেখানে আজান দেয়, সেখানে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তখন তো আবার উঁচু মিনার থেকে আজান দিত। এই দাঁড়িয়ে থাকা লোকের উদ্দেশ্য যে আজান দেওয়া না—তা অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে। নিচে সবাই চিল্লাচ্ছে—“তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে তোর পাগলামি শেষ কর!” “আরে লাফা!” অবশ্য, বুড়ো একটা লোককে এভাবে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে জীবন নিয়ে হতাশ, আত্মহত্যার চেষ্টাকারী মনে করাটা ভুল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবার এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে—কী হতে যাচ্ছে এই ডানপিটে বুড়োর। তিনি...’

‘আব্বাস ইবনে ফিরনাস!’ চিল্লিয়ে উঠলাম আমি।

‘না, তিনি Armen Firman.’

‘এটা কে আবার?’

‘বলছি, আগে কাহিনি শেষ করতে দে। এবার আরমান ফিরমান লাফ দিলেন। শেষের দিকে একটু ভয় পেয়েছিলেন যদিও, কিন্তু একজন স্টান্টম্যানের কখনো পিছু হটা সাজে না। আস্তে আস্তে তিনি নিচে পড়ে গেলেন। উড়তে না পারলেও সাহস তো দেখিয়েছেন। বাজির টাকাটা পেয়ে যাবেন।’

‘বাজি?’

‘হ্যাঁ, তিনি বিজ্ঞানের জন্য কিছু করেননি। তবে দর্শকদের ভেতর থেকে দুটি চোখ তাকে দেখছিল। ৪৭ বছর বয়সি এক ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ আব্বাস ইবনে ফিরনাস। তাকে স্পেনে আনা হয়েছিলে মূলত গান শেখানোর জন্য। প্রথম প্রথম সে গ্লাস বানাত। অসাধারণ সব গ্লাস। কৃত্রিম ক্রিস্টাল তৈরির পদ্ধতি তারই আবিষ্কার। এভাবেই বানিয়েছিল চোখ ধাঁধানো একটি বিজ্ঞানঘর। অবশেষে চিন্তা করলেন অ্যারোনটিক্সে ঢোকার।’

‘আর... আব্বাস ইবনে ফিরনাসের আবিষ্কারগুলো নিয়ে কিছু বলবি না?’

‘বলছি, আগে কাহিনিটা তো শেষ করতে দে! গভীর দৃষ্টিতে পাখিদের উড়া পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। কয়েকবার মরুভূমিতে চেষ্টা চালালেন। অবশেষে ৭০ বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নিলেন, একটি পাবলিক শো হওয়া দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ।’

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ এই বলে সিনান পারলে নিজেই লাফ দিয়ে দেয়! আমরা ধরাধরি করে থামানোর পর আবার বলতে শুরু করল—‘নিজ চোখে সবাই ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখল। ১০ মিনিট ধরে আকাশে উড়লেন তিনি। চিন্তা করতে পারিস? যদি ওখানে থাকতাম তখন! পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম প্যারাশুট ফ্লাইট।[১] জান্নাতে যদি যেতে পারি রে ভাই, টাইম-ট্রাভেল করে ওই সময় চলে যাব!’[২]

‘চরম কাহিনি রে, চরম!’

‘তো এই কাহিনিটি, সম্ভবত মিথ্যা।’

‘কি!’

বানু মুসা—থ্রিলিং থ্রি

তারিক আজ কোচিং সেন্টারে আসেনি। গণিত খাতা দেওয়া হবে বলেই আসেনি, বোঝা যাচ্ছে।

ক্লাস শেষ। সিনান আর আমি তারিকের বাসার দিকে যাচ্ছি। রাস্তায় রনির সঙ্গে দেখা হলো। তাকে বললাম—'রনি! কংগ্র্যাটস। তুই গণিতে তারিকের চেয়ে দুই নম্বর বেশি পেয়েছিস।'

'কী বলিস! পরীক্ষা এত বাজে হয়েছিল, মনে তো করেছিলাম ফেল করব। তারপরও তারিকের চেয়েও দুই নাম্বার বেশি পেয়ে গেলাম! তা কত পেয়েছি আমি?'

'দুই।'

সিনান আর আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম।

তারিকের বাসার দিকে যাচ্ছি আর তার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রথম দিনের কথা মনে পড়ছে। সময়টা ছিল নবম শ্রেণির প্রথম দিকে। উচ্চতর গণিতের কিচ্ছু পারতাম না। আর নাউজুবিল্লাহ... স্যরি, নজিবুল্লাহ স্যার বাড়ির কাজ দিয়েছিলেন! সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। সিনান পর্যন্ত দেখি ভয়ে লাফাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সে বাড়ির কাজ করেছে, কিন্তু খাতা হারিয়ে ফেলেছে। পেছনের দিকে গিয়ে দেখলাম, তারিক সিনানের হারানো খাতা দেখে দেখে বাড়ির কাজ করছে! সিনানকে না বলে আমিও বসে গেলাম তারিকের সাথে। ও বারবার 'Q'-এর মতো একটি চিহ্ন দিচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'এটা কী?'

ও বলল—'থিটা।'

'মানে?'

'আরে, এই যে একটা চ্যাপটা গোল এঁকে তার পেট কেটে দিলে থিটা হয়ে যায়!'

তারিকের বাসার সামনে চলে এলাম। নক করলাম। আন্টি দরজা খুললেন।

‘আসসালামু আলাইকুম, আন্টি!’

‘ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছ তোমরা?’

‘আলহামদুলিল্লাহ! আপনি ভালো আছেন?’

‘এই তো ভালো। ভেতরে এসো, তারিক ওর রুমেই আছে।’

তারিক ল্যাপটপের সামনে বসে আছে। আমাদের দেখে রুমের বাইরে গেল।

সিনান আর আমি বসে আছি। তারিক এতক্ষণ কী করছিল ল্যাপটপে—তা দেখার ইচ্ছা হলো।

‘সিনান, তারিক মুসলিম বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে পড়ে উলটিয়ে ফেলছে!’

‘কী বলিস!’

‘হ্যাঁ, এই দেখ। কয়েকটা পিডিএফ খোলা। নোট নিয়ে পড়ছে দেখি... এই ব্যাটা এটা দেখে যা! চরম নোট নিয়েছে তো!’

‘পড়ে শোনা।’

‘ইতিহাসবিদ এসপি স্কট দ্বারা বর্ণিত—“অষ্টম শতকে ইউরোপের একজন সাধারণ মানুষের বাসস্থান : বসবাসের অনুপযোগী একটি কুঁড়েঘরে—যা পাথর ও অকর্তিত কাঠ দিয়ে নির্মিত, শুষ্ক খরকুটো দ্বারা ছাওয়া, দূর্বা দ্বারা তৈরি মেঝে, সাথে মাথার ওপর (ছাদে) সর্বদা একটা গর্তের সুবিধা—যা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায়। তাদের (ইউরোপিয়ানদের) দেয়াল ও ছাদ কালি ও গ্রিজ দিয়ে সর্বদা মাখানো থাকত।” স্কট সাহেব আরও বলেন—“জংলিদের থেকে এদের শুধু একটুখানি পার্থক্য ছিল।”[১]

মরিস লম্বার্ড বলেন—“ইসলাম পশ্চিমকে তার জংলিমার্কা কালোরাত্রি হতে টেনে বের করে আনে।”’[২]

ধাক্কা খেয়ে খাটে গিয়ে বসলাম। তারিক এত ইনফরমেটিভ রিসোর্স পায় কই! সিনানের মুখে কেবল মুচকি হাসি দেখা গেল।

বন্দি বিজ্ঞানী

লুঙ্গির মধ্যে শার্ট ইন করিয়া বাহির হইলাম। গ্রীষ্মের কালে এত কুয়াশা কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পর বুঝিলাম, কুয়াশা নহে; বরং ইহা তো কালো ধোঁয়া!

অগ্রসর হইতে থাকিলাম। পরিচিত পথ কেন যেন অচেনা লাগিতেছে। সম্মুখে দেখিতে পাইলাম একটি উদ্যান। কিন্তু এইখানে উদ্যান কোথা হইতে আসিল, তাহা মাথায় খেলিল না। দুই দিন আগেও তো এইখানে বিরাট অট্টালিকা ছিল!

উদ্যানে কেহ নাই, তবে একজন সুদর্শন বুড়োকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে দেখিয়া কৌতূহলের সৃষ্টি হইল। কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনো সাহায্য করিতে পারি কি না। তিনি আমার দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিলেন, কয়েক মুহূর্ত পর সরাইয়া লইলেন।

দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, মিনিট পাঁচেক হইবে। কোনো সাড়া-শব্দ নাই। আমি তার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তিনি কোনো গুরুত্বই দিলেন না!

অবশেষে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—'তোমার ধৈর্য দেখিয়া আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি নিশ্চয়ই কিছু জ্ঞান পাইবার উদ্দেশ্যে এত সময় ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছ, তাহা নয় কি?'

তাহার এমন বাণী শুনিব—তাহা আশা করি নাই। তবুও ভাব করিবার উদ্দেশ্য লইয়া হ্যাঁ বোধক মস্তক নাড়াইলাম।

তিনি বলিলেন—'আমি একজন আলোকবিজ্ঞানী।'

হুম। তাহার চক্ষুর দীপ্তি দেখিয়া মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিল। কিন্তু মস্তিষ্ক দিয়া ভাবিয়া বুঝিলাম, বুড়োর তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

বুড়ো বিশাল এক কাহিনি আরম্ভ করিল—‘সর্বোচ্চ সম্মাননা লইয়া আমি আমার সিভিল সার্ভিসের পড়ালেখা খতম করি। কয়েক দিনের অভ্যন্তরেই আমাকে বসরার চিফ মিনিস্টার বানানো হইল। ইহা ছিল এমন এক চাকুরি, যাহা সকলেই খুঁজিয়া বেড়াইত।’

ও বদ্দা! চাটগার তুন হড়ে বসরাৎ গিয়ে গুই। জাইগা ইভা হড়ে!

‘কয়েক দিন কাটিল, তারপর বিজ্ঞানের জন্য আমি আমার উঁচুমানের পদটি ছাড়িয়া দিলাম।’

কী গণ্ডমূর্খ এই বুড়ো!

‘বিজ্ঞান নিয়া কাজ করিতে থাকিলাম। ক্রমেই আমি চারিদিকে খ্যাত হইয়া উঠিলাম। আরও কয়েক দিন পর সমগ্র পৃথিবীতেই এক পরিচিত নাম হইয়া গেলাম।’

কী অবুঝ আমি!

‘আমার কথা অবশেষে এক পাগলার কানে গিয়া পৌঁছাইল।[১] কায়রোর ইসমাইলি ফাতিমি খলিফা; আল হাকিম। সে অবশ্য আব্বাসি খিলাফতের বেশিরভাগের ওপরই শাসন চালাইত। সে চাহিত, যেন সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ তাহার শহরে আসে। সে আরও চাহিত পুরো বিশ্ব জয় করিতে এবং কায়রোকে তাহার শ্রেষ্ঠ শহর বানাইতে।

এসব অবশ্যই ভালো, কিন্তু এই আল হাকিমের মাথায় সমস্যা ছিল। সে ইতিহাসে “পাগলা খলিফা” বলিয়া খ্যাত। ইহুদি আর খ্রিষ্টানদের অনেক সমস্যা হয় এই পাগলার জন্য। সে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের অনেক উপাসনালয় ধ্বংস করে। তালিকায় জেরুজালেমের পবিত্র সেপালকারও Holy Sepulchre in Jerusalem রহিয়াছে, যাহার ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে—এইখানে যীশুখ্রিষ্টকে শূলে চরানো হইয়াছিল, আর এইখানেই তিনি পুনর্জীবিত হইবেন। উমর ﵁ চার্চ রক্ষার ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু আল হাকিম তাহা উড়াইয়া দিলো। খ্রিষ্টান আর ইহুদিরাই তাহার একমাত্র শিকার ছিল না অবশ্য; মুসলিমরাও তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাকেন নাই। সুন্নিদের ওপর সে নানা রকম নিষেধাজ্ঞা ও বাধ্যবাধকতা চাপাইয়া দেয়। জেরুজালেমে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সুন্নিদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। শুধু শুধু তাহার মতো পাগলাদের কারণে ইসলামের নাম খারাপ হয়।[২]

The Physicist
ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানী

‘আচ্ছা তারিক, তোর ফেসবুক আইডির নাম Tarik Tariq ক্যান রে?’

বসে আছি সিনানের বাড়ির ছাদের ওপর। কোনো এক রিসার্চ পেপার পড়ছিল, আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে বলল, ইকটু পরে আসবে।

‘আসলে...বানানটা Tarik হবে নাকি Tariq হবে—সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না বলে দুটোই লেখে দিয়েছি!’

গরমের মধ্যে তারিকের নরম জোকে মজা পেলাম না। বাতাসও নেই তেমন, কাক কতগুলো চেঁচাচ্ছে। অবশেষে দেখলাম সিনান আসছে। হাতে ছোটো একটা নোটবুক।

সিনানের এ রকম অনেক নোটবুক আছে। অনেক বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে, চিন্তা-ভাবনা করে। যখন সেরা কিছু পায় বা চরম কোনো আইডিয়া আসে মাথায়, তখন কোনো এক ছোটো নোটবুকে লিখে রাখে। হামিদুদ্দিন ফারাহির মতন। বাকিটা আশা করি সে নিজের জীবনের কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারবে।

‘এসেছিস তাহলে? তাড়াতাড়ি কর! 1001 Inventions and the World of Ibn al-Haytham দেখার পর ইবনুল হাইসামের ব্যাপারে ফ্যাক্টগুলো জানার খুব ইচ্ছা হচ্ছে।’

বলতে শুরু করল সিনান—‘হাসান আল হাইসাম খুব জনপ্রিয় বিজ্ঞানী।’

তারিক জিজ্ঞেস করল—‘এই জনপ্রিয়তার কারণ কী?’

‘কারণ তো أَخِي, একটু পরই জানতে পারবি।’

‘মুহাম্মাদ আল খাওয়ারিজমি মারা গিয়েছেন অনেক দিন হলো। লোকে ভেবে বসে আছে, তার থেকে ভালো বিজ্ঞানী আসা সম্ভব না। কিন্তু এক ছেলে এসে সব উড়িয়ে

দিলো। রজার বেকন, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, কেপলার, উইটেলো, কাভালিয়েরি, লিউয়েনহয়েক, দেকার্ত, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও সবার ওপর এনার প্রভাব পড়েছে।[১] আরে তার অপটিক্সের বইগুলো তো পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের পাঠ্যবই থেকেছে বহু বছর। তার ব্রেইনকে অনেকে আইনস্টাইনের ব্রেইনের সাথে তুলনা করেন।[২] সত্যি বলতে, এই হাসান ইবনুল হাইসাম ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানী।'

'ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানী!' তারিক ধাক্কা খেল।

'হুম। তিনিই আসল পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক।[৩] আমাদের ফিজিক্স বইয়ে তো রজার বেকনের নাম লেখা। মূলত সব জায়গায় তার নাম থাকে। একদম ভুল। রজার বেকন সর্বপ্রথম এটি ইউরোপে আনেন, ইতিহাসে না। তারপর আবার তার এটার ওপর নিজের প্র্যাকটিস রং চড়িয়ে বলা হয়েছে।[৪] এই বিকৃত ইতিহাসটা দেখলেই মাথা গরম হয়ে যায়! মুসলিমদের মধ্যে ইবনুল হাইসামই প্রথম গ্রিকদের পুরাপুরি রিজেক্ট করেন।[৫] প্রত্যেকটা বৈজ্ঞানিক কাজকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করার কাজ ইবনুল হাইসামই প্রথম করেন। এর আগে অনেক গ্রিক এ ব্যাপারে জানত, তবে তারা তা প্র্যাকটিস করত না। নিজের মত কীভাবে প্রমাণ করতে হবে—সবাই এটা নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

সাধারণভাবে উনিশ শতকের আগে বিজ্ঞান বলতে কিছু ছিল না। তার আগে সায়েন্স ছিল মূলত প্রাকৃতিক দর্শন। তখন এমন অনেক জিনিসকেই বিজ্ঞান বলা হতো, যা আমরা বর্তমানে কখনোই বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি দেবো না। ইবনুল হাইসাম মূলত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শুরুটা করেছিলেন। বর্তমানে অসংখ্য পদ্ধতি আছে। একেক বিষয়ে একেক পদ্ধতি। আমরা একে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি বলি। বিজ্ঞানে অনেক ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্ট করাও যায় না। যেমন—তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান। তবে ইবনুল হাইসামের সাথে এক্সপেরিমেন্টাল ও ইনডাক্টিভ মেথোড বিজ্ঞানে প্রয়োগ শুরু হয়। যার জন্য তাকে প্রথম বিজ্ঞানী বলে দাবি করা হয়।

বেকনে ফিরে আসি। রজার বেকন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কৃতিত্ব ইবনুল হাইসামকে না দিয়ে দিয়েছেন পিটার পেরেগ্রিনাসকে। এর অবশ্য কারণ ছিল। ইবনুল হাইসামকে কৃতিত্ব দিলে খ্রিষ্টান সমাজে গ্রহণযোগ্যতা হারানোর সম্ভাবনা ছিল।[৬] বেকন অবশ্য পরে আরবি আর আরবি বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সত্য জ্ঞানের একমাত্র পথ বলে স্বীকার করেছিলেন।[৭] তার ওপর ইসলামি প্রভাব নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। কয়েক দিন আগে স্কুলে ম্যান্ডোনেটের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?'[৮]

মেকানিক্যাল মাইন্ড

মধ্যযুগে রোবটিক্স

‘রোবট! এদিক আয়।’

রোবট বলে ডাকে সবাই, খারাপ লাগলেও বাস্তবতা মেনে নিলাম। কিন্তু এত কাছের বন্ধু যদি এমন করে, তাহলে খুব খারাপ লাগে। তা-ও ক্লাসের মধ্যে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে ডাকছে!

তারিক বলল—‘সম্মানিত সহপাঠীবৃন্দ! আমরা এখানে যে অসাধারণ যন্ত্রটি দেখতে পারছি...’ সবাই হেসে উঠল।

‘...এটির আবিষ্কারক বদিউজ্জামান আল জাজারি। এই রোবটজাতির সূচনা হয়েছিল তারই হাতে...’ সবাই আবার হেসে উঠল। ‘এই... এইক... এটা তো হাসার কিছু না... সত্য ইতিহাস।’[১] এবার কেউ হাসল না, কিন্তু আমি হেসে উঠলাম।

সিনান তারিককে সমর্থন দিলো—‘না, হাসছিস কেন তোরা? তারিকের কথা ঠিক আছে তো।’ সবাই অবশেষে মনোযোগ দিলো।

ভালো ছাত্র হওয়ায় সবাই সিনানকে দাম দেয়—‘ইতিহাসের প্রথম রোবট, আশ্চর্যজনক কিছু যন্ত্র—যেগুলো পানি পরিবেশন করত, বাদ্য বাজাত নিজে নিজে। তিনিই সর্বপ্রথম এমন যন্ত্র তৈরি করেন, যেসব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারত। তিনি বানিয়েছিলেন রোবটদের একটি ব্যান্ড; রাজকীয় মেহমানরা এলে সেসব ছেড়ে দেওয়া হতো।[২] তিনি ময়ূরের মতো দেখতে কিছু রোবট বানিয়েছিলেন, সেগুলো অজুর পানি ঢেলে দিত এবং মানুষ অজু করতেন। কিছু কিছু রোবট আবার তোয়ালাও দিত!’[৩]

‘কী পাগলামি! মধ্যযুগে অটোমেটেড মেকানিক্স? রোবট!’ বলল কেউ কেউ।

সিনান নাটকীয়ভাব বাদ দিয়ে মুচকি হেসে বলল—‘বদিউজ্জামান ইবনে ইসমাইল আল জাজারি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন মাস্টারমাইন্ড, বুঝলি? তার বইয়ে ৫০টা অসাধারণ যন্ত্রের বর্ণনা আছে। ছোটো থাকতে একদিন খেয়াল করলেন, হাত-পায়ের মতো

ছোটো ছোটো জিনিস মিলে যেমন একটি দেহ গঠিত হয়, তেমনই ছোটো ছোটো মেকানিক্যাল জিনিস একত্র করলে অনেক বড়ো কিছু হয়, অসাধারণ কিছু হয়। তার বেশিরভাগ যন্ত্র অবশ্য পানি আনা-নেওয়া রিলেটেড। ঘড়ি বানাতেও তিনি সেই রকম দক্ষতা দেখান। ইতিহাসের সেরা একটা আবিষ্কার স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি। মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে অনেক চমৎকার মেকানিক্যাল ঘড়ি তৈরি হয়।[৪] এখন তো আমাদের হজম করানো হয়, ইউরোপে ১৪শ শতকে অটোমেটেড ঘড়ির আবিষ্কার হয়। এটা বিরাট ভুল। ইউরোসেন্ট্রিক স্কলাররা এ কথা বলে ঠিক আছে, কিন্তু আবার অন্য মুখে স্বীকার করে—কে আবিষ্কার করেছে, তার কোনো আইডিয়া তাদের নেই।'

কয়েকজন হেসে দিলো।

'অটোমেটেড জিনিসপাতি অনেক আগে থেকেই ছিল; গ্রিকদের মাঝে, চাইনিজদের মাঝে। ইউরোপে মুসলিম বিশ্বের মাধ্যমে অটোমেটেড ঘড়ি পৌঁছায়। অবশ্য ইন্ডিয়ান ট্র্যান্সমিশন রুটও আছে। কিন্তু ইউরোপে জিনিসটার উৎপত্তি একেবারেই ফাঁকা কথা।[৫]

আল জাজারি অনেক ধরনের ঘড়ি বানিয়েছিলেন। Elephant Clock, Candle Clock, Citadel Clock, Clock of the Boat, Castle Clock, Peacock Clock হলো বিভিন্ন ধরন। সবগুলোর মূল প্রিন্সিপাল একই—প্রেশারাইজড পানি ব্যবহার করে এসব অটোমেটেড করা হয়। সবগুলোই Water Clock; শুধু ডিজাইনে ভিন্নতা। ডিজাইনে ভিন্নতা আনতে গিয়ে অবশ্য টেকনোলজিক্যাল প্রয়োগ ও পরিবর্তনেও সৃজনশীলতা আনতে হয়। তিনি অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ক্লকও বানিয়েছিলেন—যা সূর্য, চাঁদ ও অন্যান্য নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহের মুভমেন্টের সময় প্রদর্শন করত। ঘড়ি নিয়ে তার *ম্যাগনাম ওপাস আল জামি বাইনাল ইলম ওয়াল আমালুন-নাফি ফি সিনাআত আল হিয়াল* গ্রন্থে তিনি ১০টি অধ্যায় লিখেছেন।[৬]

তিনি রক্ত পরিমাপের একটা যন্ত্রও বানিয়েছেন। এর আগে ইতিহাসে রক্ত পরিমাপ করতে পারে এমন কোনো যন্ত্রের রেকর্ড নেই।[৭] আরবের কনটেক্সটে তার আবিষ্কারের অনেকগুলোই ওয়াটার পাম্প। তার বানানো যন্ত্র দিয়ে কোনো আঙুল নাড়ানো ছাড়া বিপুল পরিমাণে পানি তোলা যেত। মেকানিক্স জটিল বিষয়। এসব বুঝতে ভয়ংকর প্যারা খেতে হয়। তাই তার যন্ত্রগুলোর বর্ণনা দিতে পারলাম না। শুনলে বুঝতি তার ট্যালেন্ট। যেমন—তিনি Double acting principle-এর অগ্রদূত।[৮] কিন্তু এটা কী, আমি ঠিক বুঝি নাই। তোরা কেউ জানতে পারলে জানাস।'[৯]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল

আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয়ের নাম আভনিশ, আভনিশ সরকার। একসময় ভালো বন্ধু ছিল। ক্লাস সিক্স থেকে তেমন কথা বলে না। সেভেন থেকে একদম পাত্তাই দেয় না। পার্থক্যটা কী, কোনো সময় বুঝে উঠতে পারিনি। সে সময় কী হয়ে গেল তার, কী কারণে বন্ধুত্ব শেষ করে দিলো। কিছু ভালো দক্ষতাসম্পন্ন ছেলেদের বড়ো হলে কীসের রোগে ধরে—তা কখনোই বুঝতে পারিনি।

আজ চতুর্থ ক্লাসের পর ছুটি হয়ে যাওয়ার কথা। যথারীতি হয়ে গেল। কিন্তু স্যার চলে যাওয়ার পর আভনিশ এসে আমাদের বেঞ্চের সামনে দাঁড়াল—'সিনান, ভালো প্রতিভাধর ছেলে ছিলি। কী ইসলামের ইতিহাস পড়ে সময় নষ্ট করছিস, সাথে দিয়ে আছে রোবট আর তারিকের মতো কিছু রাস্তার পোলাপান! নিজের সময় সব বরবাদ করছিস।'

আভনিশের কথা শুনে তারিক জ্বলে যাচ্ছে। শুধু কালো বলে চেহারার লাল আভার পরিস্ফুটন হচ্ছে না। আমি রাগ না করলেও কষ্ট পেলাম।

সিনান আড়চোখে দাঁতভাঙা জবাব দিলো—'সালিহ ﷺ-কেও তার আশপাশের মানুষরা এই কথাই বলত।[১] দেখেছিস, আল্লাহ আগের থেকেই জানতেন, তুই এমন কথা বলবি। এজন্য তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। আর ধন্যবাদ, তোর মতো মূর্খ মানুষদের কাছে গালি খেলেই আমি সৎ পথে আছি। এটা একটা নিদর্শন।'

ওরে মাইর! আভনিশ আমাদের যা বলে আঘাত করেছিল, সিনানেরটা তো তার থেকেও বেশি কড়া।

আভনিশ বাইরে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। শান্তভাবে বলল—'অশিক্ষিত বলছিস কাকে? রোল ১ কে, পাঁচ বছর ধরে?'

'তোর স্কুল রেজাল্ট, তোর সার্টিফিকেট কোনো শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ না। শিক্ষা বলতে বোঝাচ্ছি, শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব আর বই পড়া প্রবন্ধে যা বোঝানো হয়েছে তা। দুবছর ধরে তো ফার্স্ট হওয়ার জন্য পড়ছিস, শেখার জন্যও পড়ে দেখ দু-একবার।'

সিনানের আঘাত আভনিশ গায়ে মাখল না। ব্রিলিয়ান্টদের মধ্যে ডিবেট দেখার মজাই আলাদা। কী অসাধারণভাবে নিজেদের ব্রেইন, নিজেদের জিহ্বা কন্ট্রোল করে তারা! কী চমৎকারভাবে নিজেদের ইমোশন নিয়ন্ত্রণ করে!

আভনিশ মেইন পয়েন্টে এলো—'এসব বিজ্ঞানীদের নিয়ে গর্ব করার মানে কী, আমার বুঝে আসে না। সেসব বিজ্ঞানী আদতে মুসলিম ছিল কী ছিল না, তা-ও গর্বকারীদের জানা থাকে না। কেউ একজন অবদান রাখতে পারলেই তাকে নিয়ে লাফানো শুরু করে দেয়। যেমন—সাবিত ইবনে কুররা, হুনাইন ইবনে ইসহাক, কুস্তা ইবনে লুকা—কেউই মুসলিম ছিল না। ইবনে সিনা নামে মুসলিম হলেও প্র্যাকটিস করত কই!'

সিনানের দিকে তাকালাম। কেন সে চুপ করে আছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। ইতোমধ্যে ভালোসংখ্যক দর্শকও জমে গিয়েছে।

'আবার আরেকজন আছেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজি। কেমিস্ট্রি আর মেডিসিন, দুটি ক্ষেত্রেই কাঁপিয়ে দিয়েছেন। ৪-৫টা বিষয়ের জনক বলা চলে। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এই অন্ধবিশ্বাসে পড়ে থাকেননি; হয়ে গেলেন অ্যাপস্টেট। মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ, তাদের নবি— কোনো কিছুকেই গালাগালি করতে ছাড়েননি। তারপরও এসব আত্মমর্যাদাহীন মানুষরা তাকে নিয়ে গর্ব করে আকাশ ফাটিয়ে দেয়। তারপর আবার এসব মুসলিমরাই ঘুরেফিরে আমাকে এসে বলে মূর্খ।'

আভনিশ যদিও অ্যারোগেন্ট, কিন্তু তার টেকনিক খুবই ভালো। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নিজের মাথা না খুইয়ে অপেক্ষা করে সঠিক সময় আসার। তখন প্রতিপক্ষের মগজ বের করে আনে। দুঃখজনক কথা হচ্ছে, সে নন-মুসলিম হওয়ার পরও এমন কন্ট্রোল দেখাচ্ছে; আর তারিক, আমি, আমরা মুসলিম হওয়ার পরও ক্ষেপে গিয়ে একদম সব হারিয়ে বসে থাকি।

'হয়েছে তোর?' সিনান বলল।

'হুম।'

'তো এবার আমি বলি?'

সিনান লম্বা চালাল—'আবু বকর রাজির ব্যাপারটি খুবই অস্পষ্ট করা হয়েছে। আল বেরুনি তাকে নিয়ে ভালো কাজ করেছেন। ইসলাম নিয়ে আবু বকর রাজির জঘন্য কথাবার্তা অনেকাংশ আসে আবু হাতিম আল রাজি নামের একজন থেকে।

বিজ্ঞানে আলিমগণ

ফেসবুকে কোনো এক ভাইয়ের সাথে নাকি সিনানের কথা হয়েছে। তিনি দেখা করতে বলেছিলেন। এমনিতেও বই কিনতে আমাদের আন্দরকিল্লা যেতেই হতো। তো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তার সাথেও দেখা করে ফেলি। আমরা তিনজন আন্দরকিল্লায় পৌঁছালাম।

মসজিদ লাইব্রেরিতে ভাইটির সাথে দেখা হওয়ার কথা। তিনি নাকি মুসলিম বিজ্ঞানীদের নিয়ে কিছু কথা বলবেন। আমরা লাইব্রেরিতে ঢুকলাম। তিনি একটি চেয়ারে বসে ইসলামের আলিমদের নিয়ে লেখা আদিল সালাহির একটি বই পড়ছিলেন। সিনানকে তার দিকে গিয়ে মুসাফাহা করতে দেখে তা বুঝলাম। গৌড় বর্ণের চেহারায় ড. সাঈদ রামাদান আল বুতির মতো দাড়ি, চোখগুলো সাদা। শান্ত স্বভাবের মনে হয় দেখে। তিনি বললেন—'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আমি আব্দুল কাহির।'

'ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি তারিক, আপনি ভালো আছেন?'

'আলহামদুলিল্লাহ! ভাইয়া, তোমার নাম কী?'

'আরমান।'

'বসো। সিনানের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, তোমরা মুসলিম বিজ্ঞানীদের নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করো। আর এ বিষয়ে তোমাদের প্রচুর আগ্রহ। সিনান আমাকে তোমাদের লাইব্রেরির চমৎকার ঘটনাটি বলল। তা শুনে লাইব্রেরিয়ানের সাথে দেখা করার ইচ্ছাও জেগেছে। আর তোমাদের মতো কম বয়সি ছেলেদের এমন একটা বিষয় নিয়ে আগ্রহী দেখেও খুব ভালো লাগল। যাহোক, আমি আজ তোমাদের ইসলামের আলিমদের বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে কিছু কথা বলব।'

টপিকটা পছন্দ হলো।

'আলি ইবনে হাজমকে চেনো তোমরা?'

যথারীতি তারিক লাফিয়ে উঠল—‘হ্যাঁ হ্যাঁ! উনার কিতাব *আখলাক ওয়াল সিয়ার* বইটার ইংরেজি অনুবাদ দেখেছিলাম।’

‘কিন্তু পড়িসনি।’ গুঁতা মারলাম।

‘না... পড়া হয়নি’—বলে লজ্জা পাওয়া মুচকি হাসি দিলো তারিক।

সিনান আর আমি হেসে উঠলাম।

‘আচ্ছা সমস্যা নেই। Comparative Religious Studies-এর নাম শুনেছ?’

‘অবশ্যই!’

‘হ্যাঁ, বাংলাদেশে তো এটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যাহোক, আলি ইবনে হাজম এটার জনক।[১] তিনি খুবই বিখ্যাত একজন আলিম। আন্দালুসের ইতিহাসের সবচেয়ে খাঁটি চিন্তাবিদদের একজন।[২] ইসলামে উনার লেভেলের যৌক্তিক চিন্তক নেই বললেই চলে। তার সাথে তুলনা করা যায় ইবনে তাইমিয়াকে।[৩] তার জীবদ্দশায় মানুষরা বলত—“ইবনে হাজমের জিহ্বা আর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের তরবারি ভাই ভাই।”[৪] লেভাই প্রোভেঞ্চাল স্প্যানিশ ইতিহাসের অথোরিটি। লেভাই প্রোভেঞ্চালের একজন স্টুডেন্ট রজার আর্নালদেজ। তিনি ডক্টরাল থিসিস করেছেন ইবনে হাজমের ওপর। অনেকে ইবনে হাজমকে দেকার্তের সাথে তুলনা করেন।[৫] ইবনে হাজমের মতে, যখন স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, তখনই ভুল হয়। সত্যের অনুসন্ধানে স্মৃতিশক্তির ভূমিকা পরে দেকার্ত আলোচনা করেন।[৬] কিন্তু সম্ভবত তুলনাটা করা উচিত ছিল প্যাসকেলের সাথে। ইবনে হাজমের মতো প্যাসকেলও তার বই *Les Pensees*-এ নিজের চিন্তাগুলোকে সাজাতে চেষ্টা করেছেন।’

‘নামের অর্থটা...’ সিনান বলতে নিল।

‘Thoughts’ সাথে সাথে বললেন আব্দুল কাহির ভাই, ‘তো... প্রতিটি ভাবনা যেন একটি ফাংশন আর প্রতিটি ফাংশন থেকে একটি একটি আইডিয়া বের হয়; প্রত্যেকটি ভাবনা একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত।[৭]

বিবর্তনবাদ ও মুসলিম বিজ্ঞানীগণ

প্রি-টেস্ট। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পরীক্ষা। রোলের তারতম্য থাকায় আমাদের ও সিনানের রুম আলাদা। হলে গিয়ে দেখি, রনি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। 'কি রে রনি, কী হয়েছে তোর?'

'গত দেড় বছর যে কী পড়েছি! বই খুলে কিচ্ছু চিনতে পারছি না।'

পেছন থেকে তারিক লাফিয়ে উঠল—'পৃথিবী বদলে গেছে, যা দেখি নতুন লাগে!'

২৯টি বহুনির্বাচনী দাগিয়ে ফেলেছি, একটি বুঝতে পারছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করব? যদিও এটা অনুচিত, কিন্তু না পারতে করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাকে জিজ্ঞেস করা যায়? বিশ্বাসও নেই, ভুল বলে দেয় নাকি! জানি, তারিক কোনো কাজের না, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য বলে তাকেই জিজ্ঞেস করলাম। সে কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বলল—'সমস্যা নেই, চারটাই দাগিয়ে দে, একটা হয়ে যাবে।'

পরীক্ষা শেষে তারিককে জিজ্ঞেস করলাম—'কত অ্যানসার করেছিস?'

উত্তর দিলো—'কত অ্যানসার করেছি তা জানতে চাই না!'

পরেরদিন যেহেতু বন্ধ আছে, তাই আমরা তিনজন সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিকালে বের হওয়ার। আসর নামাজ আদায় করে তাদের সাথে মিলিত হলাম। 'সিনান, তোকে অনেকদিন ধরে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম। বিবর্তনের ব্যাপারটা কী রে? মুসলিম বিজ্ঞানীরা দেখছি এর সাথে সংশ্লিষ্ট।'

তারিক বলল—'অনেক আগেই তো মনে হয় বিবর্তন নিয়ে বিভিন্ন জাতিতে কল্পনা-জল্পনা হয়ে এসেছে।'

সিনান—'হ্যাঁ, প্রাচীন গ্রিস বা চায়নাতেও দেখা যায়, তবে সেগুলো বর্তমান সেন্সে বিবর্তন না কোনোটাই। বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার ছড়াছড়ি কেবল।'

'কোনো সন্দেহ নেই হলো মুসলিমদের বর্ণনায়, তবে মুসলিমদের বর্ণনা মডার্ন এভোল্যুশনের মতোই ছিল!' আমি বললাম।

এবার উলটো হলো। তারিক আর সিনান আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

'নাসিরুদ্দিন তুসি বলেছিলেন—যেসব প্রাণী দ্রুত নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, তারা লম্বা দৌড়ে টিকে থাকতে পারে। তিনি মিউটেশনের কথা বলছেন, যা ডারউইনকেও ছাড়িয়ে যায়। ২০ শতকের এভোল্যুশনারি থিংকিং-এ চলে গেছেন তিনি![১]

ইবনে খালদুন, তিনি তো সরাসরিই বলে দেন—বাঁদর ও মানুষের অ্যানসেস্টর বা পূর্বপুরুষ একই![২] ইবনে তোফায়েলের ব্যাপারে তো তুই স্টাডি করেছিস, তার মাঝের এই চমৎকার জিনিসটা মিস করে গেলি কীভাবে? তার বইয়ের শুরুতেই তো তিনি বলেছেন—অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ এসেছে। মানে তিনি Abiogenesis-এর কথা বলছেন![৩] ইমাম রাগিব আল ইসফাহানি পর্যন্ত লিখেছেন বিবর্তন নিয়ে![৪] আল মাসুদি বলেছেন বিবর্তন নিয়ে[৫], ইবনে বাজ্জা লিখেছেন।'[৬]

'ডারউইনের সময়কার বিজ্ঞানী জন উইলিয়াম ড্রেপার বলেছেন—বিবর্তন হচ্ছে মুসলিমদের বিজ্ঞান। তার বইয়ে তিনি লিখেন—আমাদের আজকের এই বিবর্তন পড়ানো হতো তাদের, মানে মুসলিমদের বিদ্যালয়ে।[৭] আহমাদ আল নিজামি আল আরুদি, আল বেরুনি, আল জাহিজ, ইবনে মাসকাওয়ায়হ, ইবনে খালদুন, ইখওয়ান আল সাফা, মুহাম্মাদ আল নাকশাবিসহ অনেক বিজ্ঞানী ডারউইনের অনেক আগেই তার থিওরির বিভিন্ন দিক বাতলে দেন। কারও কারও বর্ণনা বেশি জটিল, কারোটা একেবারে সাধারণ। এদের মধ্যে ইবনে মাসকাওয়ার বর্ণনা বাইরে থেকে দেখতে একদম ডারউইনেরটার মতো।[৮]

জীবের ওপর প্রকৃতির প্রভাব নিয়ে সবার আগে আলোচনা করেছেন আল জাহিজ। ৩৫০টা পশুর ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেছেন তিনি।[৯] জালালুদ্দিন রুমির বিশ্ববিখ্যাত *মসনবি-তে* একটা ক্রম আছে এ রকম : খনিজ থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে পশু, পশু থেকে মানুষ।[১০] কবি আ-মাআরির মধ্যে পাওয়া যায়। বোঝাই যাচ্ছে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা বায়োলজিক্যাল এভোল্যুশনের প্রতিষ্ঠাতা। আল বেরুনির বর্ণনা নিয়ে তো J. Z. Wilczynski একটা বই-ই লিখে ফেলেছেন—*On the Presumed Darwinism of al-Biruni Eight Hundred Years before Darwin*।

নারী

‘No one really feels the path I seek and
No one’s going to care as much as me and,
No one seems to know our history, and
Stories are told for the world to see!’

শুয়ে আছি আর ডায়েরির পাতা উলটাচ্ছি। যখন ছোটো ছিলাম, তখন বড়ো ভাইয়ের বন্ধু আমাকে কিছু বই গিফট দিয়েছিলেন। ‘আজব শিশু’; ইবনে তোফায়েলের বইয়ের বাচ্চা ভার্সন, ‘জ্ঞান পাগলা এক বুড়ো’; ইবনে খালদুনকে নিয়ে লেখা একটি বই ইত্যাদি। সাথে দিয়েছিলেন ডায়েরিটি। ক্লাস এইট পর্যন্ত খুব যতনে রেখে দিয়েছিলাম তাকের ওপর। তারপর চিন্তা করলাম, ডায়েরি এভাবে ফেলে রাখলে তো দেওয়ার উদ্দেশ্যই বৃথা! তারপর থেকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখতে শুরু করলাম।

পৃষ্ঠা উলটাতে উলটাতে একটা ঘটনা দেখতে পেলাম। মনে পড়ল, J.S.C পরীক্ষার দুদিন বাকি, আর আমি আমার ভাইয়ের ভার্সিটিতে অ্যারাবিক ক্লাস করছি! যখন ক্লাস এইটে ছিলাম, তখন আমার ভাই সিনিয়র অ্যারাবিক কোর্সে আমাকে নিয়ে যেত। জেএসসি পরীক্ষার দুদিন আগে সেখানে যাওয়া পাগলামি ঠেকতে পারে, কিন্তু সেটিই ছিল কোর্সের সেরা ক্লাস।

রিডিং ক্লাস। আমি বসে বসে খাতায় আঁকিবুঁকি করছি। স্যার এলেন। পড়ানো শুরু হলো। আমি অবশ্য তখনও ছবি আঁকতে ব্যস্ত। কারণ, আমাকে পড়া ধরা হবে না, আমি অতিথি। প্যাসেজ ছিল আয়িশা ﵂-এর ওপর।

স্যার প্যাসেজ পড়ে পড়ে বাংলায় বুঝিয়ে দিলেন এবং সাথে নিয়ে এলেন আরও অনেক ফ্যাক্ট। আয়িশা ﵂-কে সুপারস্টারের মতো মনে হচ্ছে।

স্যারের কল এলো, কথা বলা শেষে বললেন—‘পরবর্তী স্যার আসছেন না; কিছু আলাপ করবেন, না চলে যাবেন?’

‘আয়িশা ﵂ বিদ্বান মহিলা ছিলেন, শিক্ষকতা করতেন, পলিটিক্স নিয়ে ধারণা ছিল এবং চিকিৎসা নিয়েও তো জানতেন।’ রহিম স্যার বললেন।

এখানে অনেক বড়ো বড়ো মানুষ ক্লাস করতে আসেন। রহিম স্যার কোন এক স্কুলের যেন প্রিন্সিপাল। চিন্তা করতে কেমন যেন আজব লাগে : ক্লাস এইটের স্টুডেন্ট একটি বড়ো স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে বসে ক্লাস করছে!

রহিম স্যার আবারও বললেন—‘কিন্তু এখন দেখেন, আধুনিক নামধারী বিভিন্ন মানুষ এমন কথা বলে, যেন মুসলিম হলে, পর্দা করে চললে কিছুই করা সম্ভব না!’

আলাপ তাহলে। আমাদের এই ক্লাসগুলোতে সব সময়ই এমনিতে মূল ক্লাস শেষে ১০-১২ মিনিট আলোচনা হয়ে থাকে। আমার ভাই বলল—‘হ্যাঁ, মনে হয় যেন জ্ঞান হিজাবের কাপড়ে গিয়ে আটকে যায়, মগজে আর ঢুকতে পারে না।’

স্যার মাথা নাড়িয়ে বললেন—‘হুম, আপনাদের কথা ঠিক। আসলে আগেকার নারীরা আলোতে আবদ্ধ ছিলেন—যেখানে বর্তমানের নারীরা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চলেন দেখি ইতিহাস কী বলে।’

আঁকিবুঁকি বন্ধ করে প্রস্তুত হয়ে বসলাম।

‘প্রথম যেটা ক্লিয়ার করা প্রয়োজন, শারীরিক ভিন্নতার জন্য নারী-পুরুষের মাঝে ইসলাম অনেক পার্থক্য করে, কিন্তু জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে সবার সমান দায়িত্ব। পুরুষেরও জ্ঞান অর্জন করতে হবে, নারীরও।’

‘একটা কথা স্যার।’ আমার ভাই বলল—‘বর্তমানে তো স্যার ঘরে বসেই অনলাইনে সব ধরনের পড়ালেখা করা যায়। বেশিরভাগ যারা বাইরে যেতে চায়, তারা কিন্তু জ্ঞান অর্জনের জন্য তা চায় না।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো পয়েন্ট। নিয়্যাত বিকৃত মূলত বেশিরভাগেরই। কিন্তু সারাক্ষণ ঘরে থাকা তো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না। মাহরামের সাথে মাঝেমধ্যে বাইরে যাওয়া উচিত।’

বিজ্ঞানের ইতিহাস

জুমার নামাজের পর তারিক, আমি ও সিনান তিনজনে মিলে আলোচনা করি। কিন্তু আজ তা হলো না। সিনান বলল—'আভনিশ তার বাসায় আমন্ত্রণ করেছে। তোরাও যাবি আমার সাথে।'

আমি কারণ জানতে চাইতে নিলাম, কিন্তু তারিক বাধা দিলো—'আমন্ত্রণ? নিমন্ত্রণ করল না কেন?'

আমরা হেসে দিলাম। অবশেষে বললাম—'কীসের জন্য যেতে বলেছে সে?'

'কী আর, তর্ক করবে?'

'ছেলে তো ব্রিলিয়ান্ট আছে, এতদিন গবেষণা করে আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে হয়তো-বা।'

'চল দেখি, কী হয়।'

আমরা যথাসময়ে আভনিশের বাসায় উপস্থিত হলাম। আমাদের বসতে দিয়ে সে ভেতরে গেল। নিমন্ত্রণ করেনি ঠিক, তবে নেমন্তন্নের ব্যবস্থা করেছে। তার ছোটো ভাইকে দিয়ে চানাচুর, বিস্কিট ও কফি পাঠাল।

তারিক তাকে কাছে ডাকল—'এদিকে আসো তো দেখি... তোমার নাম কী?'

'আমি নির্ভীক।'

'ওরে! তোমাকে দেখে তো আমার ভয় করছে এখানে!'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর নির্ভীক লাফিয়ে উঠল—'ভাইয়া ভাইয়া! আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

তারিক এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর প্রশ্ন করার অনুমতি দিলো।

‘ভাইয়া, শয়তানের বউয়ের নাম কী?’

পড়ল তারিক বিপাকে! আমার কানের কাছে এসে বলল—‘অদ্ভুত প্রশ্ন করে ছেলেটা। আভনিশের ভাই তার মতোই ত্যাড়াইল্লা। মান-সম্মান তো বাঁচাতে হবে ছোটো ভাইয়ের সামনে।’

সিনান বলল—‘চেষ্টা কর তারিক, আমরা তোর সাথে নেই!’

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—‘আমি তো জানি না... মানে... আমাকে তো দাওয়াত দেয়নি বিয়েতে!’[১]

এরই মধ্যে আভনিশ এসে তার ভাইকে বকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলো।

সিনান বলল—‘এবার বল, যে কারণে ডেকেছিস।’

একটি কাগজ হাতে নিয়ে বসল আভনিশ। আজ তাহলে লম্বা চলবে...

‘মুসলিমরা কত্ত বড়ো বাটপার! হিন্দুদের থেকে নাম্বার থিওরি মেরে দিয়ে নিজেরা কৃতিত্ব নিয়ে নিয়েছে।’

আভনিশের কথা শুনে তো তারিক হেসেই কুটি কুটি।

‘হাসছিস কেন?’ তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

‘মুহাম্মাদ আল খাওয়ারিজমির বইয়ের নাম ছিল *কিতাব আল হিসাব আল হিন্দি।* মুসলিমরা তো হিন্দুদেরই ক্রেডিট দিচ্ছিল। পরে ইউরোপিয়ানরা মুসলিমদের নাম দিয়ে দিলে আমাদের কী দোষ!’

আভনিশ যে ভাব নিয়ে বলা শুরু করেছিল, তারিক তাকে একদম গুঁড়িয়ে দিলো।

সিনান বলল—‘হ্যাঁ, তাকে ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম গণিতবিদরা নিজেরাই হিন্দুদের ক্রেডিট দিচ্ছিলেন।[২] পশ্চিমারাই ইসলামের নাম দেয়, আবার পশ্চিমারাই ইসলামকে গালাগালি করে!’[৩]

কী অপমান!